র‍্যাবিস : একটি নীরব জনস্বাস্থ্য সংকট

মোঃ খালিদ হাসান

নেত্রকোণার সুলতানপুর গ্রামে গত বর্ষায় সাত বছরের রাফি তার বাড়ির উঠানেই কুকুরের কামড় খেয়েছিল। পায়ে সামান্য ক্ষত, একটু রক্ত — মা ভেবেছিলেন হলুদ লাগিয়ে দিলেই সারবে। গ্রামের কবিরাজ বললেন, "ওঝা দিয়ে ঝাড়ফুঁক করো, সব ঠিক হয়ে যাবে।" পরিবার সেটাই করল। তিন সপ্তাহ পর রাফির গলায় পানি আটকে যেতে শুরু করল। আলোয় চোখ জ্বলত, শরীর খিঁচুনিতে কাঁপত। যখন জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলো, ডাক্তারমাথা নিচু করলেন। তখন আর কিছু করার ছিল না। রাফির গল্প কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। বাংলাদেশে প্রতি বছর এমন শত শত রাফি নীরবে হারিয়ে যায়। তাদের মৃত্যু পরিসংখ্যানে ওঠে না, সংবাদপত্রে আসে না, নীতিনির্ধারকদের ঘুম ভাঙায় না। র‍্যাবিস দেশে একটি অদৃশ্য মহামারি — যা প্রতিরোধযোগ্য, অথচ প্রতিদিন মানুষের প্রাণ নিচ্ছে।

র‍্যাবিস একটি ভাইরাসজনিত রোগ যা Rhabdoviridae পরিবারের Lyssavirus গণের অন্তর্গত। সংক্রামিত প্রাণীর কামড় বা আঁচড়ের মাধ্যমে লালারসে থাকা ভাইরাস মানবদেহে প্রবেশ করে। এরপর ভাইরাসটি ধীরে ধীরে পেরিফেরাল নার্ভ বেয়ে মস্তিষ্কে পৌঁছায় এবং কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রকে ধ্বংস করে দেয়। রোগটির ইনকিউবেশন পিরিয়ড সাধারণত ২ সপ্তাহ থেকে ৩ মাস, তবে কদাচিৎ এক বছর পর্যন্ত হতে পারে — কামড়ের স্থান মস্তিষ্কের কাছে হলে সময় কমে যায়। প্রাথমিক লক্ষণগুলো সাধারণ জ্বরের মতো: মাথাব্যথা, অবসাদ, কামড়ের স্থানে জ্বালাপোড়া। পরে দেখা দেয় hydrophobia (পানির প্রতি আতঙ্ক), aerophobia (বায়ুর প্রতি আতঙ্ক), খিঁচুনি, আক্রমণাত্মক আচরণ এবং চেতনা হারানো।

র‍্যাবিসের সবচেয়ে নির্মম বৈশিষ্ট্য হলো — একবার উপসর্গ দেখা দিলে বেঁচে ফেরার সম্ভাবনা প্রায় শূন্য। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) তথ্যমতে, উপসর্গ প্রকাশের পর মৃত্যুহার ৯৯.৯% — পৃথিবীর ইতিহাসে মাত্র হাতেগোনা কয়েকজন এ রোগে বেঁচেছেন। অথচ কামড়ের পরপরই সঠিক চিকিৎসা নিলে — Post Exposure Prophylaxis বা পিইপি — মৃত্যু সম্পূর্ণ ঠেকানো সম্ভব। এটাই এই রোগের সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি: একটি সম্পূর্ণ প্রতিরোধযোগ্য মৃত্যু, শুধু সচেতনতা ও চিকিৎসার অভাবে ঘটছে।

বাংলাদেশের স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী , দেশে প্রতি বছর প্রায় ৩ থেকে ৫ লাখ মানুষ কুকুরের কামড়ের শিকার হন। এর মধ্যে অনেকেই সঠিক চিকিৎসা নেন না বা নিতে পারেন না। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও) -এর ২০২৩ সালের তথ্যানুযায়ী , বাংলাদেশে র‍্যাবিসে বার্ষিক মৃত্যু ২,০০০ থেকে ২,৫০০ জন। icddr,b-র একটি গবেষণা (২০২২) দেখিয়েছে যে, দেশের মোট র‍্যাবিস মৃত্যুর একটি বড় অংশ কখনও হাসপাতালে পৌঁছায় না, ফলে সরকারি পরিসংখ্যানে তারা অনুপস্থিত। বাংলাদেশে র‍্যাবিস সংক্রমণের ৯৬-৯৮ ভাগ ক্ষেত্রেই কুকুর দায়ী । দেশে বর্তমানে আনুমানিক ৭০-৮০ লাখ কুকুর রয়েছে, যার বড় অংশই বেওয়ারিশ এবং টিকাবিহীন। শহরে স্থানীয় সরকারের Catch-Neuter-Vaccinate-Return (CNVR) পদ্ধতিতে কিছু কাজ হলেও গ্রামাঞ্চলে কুকুর জনগোষ্ঠীর ওপর কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই।

নগর-গ্রামীণ বৈষম্য এই সংকটের একটি মূল দিক। ঢাকা, চট্টগ্রাম বা সিলেটের একজন কুকুরকামড়ানো রোগী কয়েক ঘণ্টার মধ্যে হাসপাতালে পৌঁছাতে পারেন, পিইপি পেতে পারেন। কিন্তু সুনামগঞ্জের হাওর এলাকার বা পার্বত্য চট্টগ্রামের দুর্গম গ্রামের একটি শিশুর কাছে এই সুযোগ নেই। যোগাযোগ-বিচ্ছিন্নতা, টিকার স্বল্পলভ্যতা, এবং আর্থিক অক্ষমতা — এই তিনটি বাধা তার জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে প্রাচীর হয়ে দাঁড়ায়। কুকুরের কামড় বা আঁচড়ের পর প্রথম কাজ হলো ক্ষতস্থান সাবান ও পানি দিয়ে অন্তত ১৫ মিনিট ধুয়ে নেওয়া। এরপর যত দ্রুত সম্ভব নিকটস্থ স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যেতে হবে এবং Post Exposure Prophylaxis (পিইপি) গ্রহণ করতে হবে। পিইপি-এ সাধারণত তিনটি উপাদান থাকে: ক্ষত পরিষ্কার, Rabies Immunoglobulin (আরআইজি) প্রয়োগ (গভীর কামড়ের ক্ষেত্রে), এবং ০, ৩, ৭, ১৪ ও ২৮তম দিনে ভ্যাকসিনের পাঁচটি ডোজ। উপসর্গ প্রকাশের আগে যেকোনো সময় পিইপি শুরু করলে মৃত্যু সম্পূর্ণরূপে প্রতিরোধ করা সম্ভব। সরকারি হাসপাতালে এটি বিনামূল্যে পাওয়া যায়।

বাংলাদেশে র‍্যাবিস মোকাবেলার সবচেয়ে বড় শত্রু সম্ভবত কুসংস্কার। গ্রামাঞ্চলে এখনও অনেক মানুষ বিশ্বাস করেন যে কামড়ানো কুকুরটি যদি বেঁচে থাকে, তাহলে কামড়ানো মানুষটিরও ভয় নেই। কেউ কেউ ঝাড়ফুঁক ও তাবিজের ওপর ভরসা রাখেন। হলুদ, নিম পাতা বা গরুর দুধ লাগানোর প্রচলন আজও আছে। সরকারি জরিপ তথ্য অনুযায়ী , কুকুরের কামড়ের পর মাত্র ৩০-৪০ শতাংশ মানুষ প্রথম ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে চিকিৎসকের কাছে যান। বাকিরা দেরি করেন — কখনো অজ্ঞতায়, কখনো আর্থিক কারণে, কখনো অবিশ্বাসে। এই বিলম্বই ঘাতক।

বাংলাদেশ সরকার ২০৩০ সালের মধ্যে র‍্যাবিস নির্মূলের লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে — ডব্লিউএইচও-র "জিরো বাই থার্টি" বৈশ্বিক উদ্যোগের সাথে সামঞ্জস্য রেখে। এ লক্ষ্যে জাতীয় র‍্যাবিস নির্মুল কৌশলপত্র প্রণীত হয়েছে, যেখানে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ও স্থানীয় সরকারকে এক সুতোয় গেঁথে “ওয়ান হেলথ” পদ্ধতিতে কাজ করার পরিকল্পনা রয়েছে। ২০২২-২৩ সালে বেশ কিছু জেলায় গনকুকুর ভ্যাক্সিনেশন ক্যাম্পেইন পরিচালিত হয়েছে। পিইপি কেন্দ্রের সংখ্যা বাড়ানো হচ্ছে, সচেতনতামূলক প্রচারণা চালানো হচ্ছে। ইউনিসেফ ও ডব্লিউএইচও এ কাজে সহযোগিতা করছে। কিন্তু মাঠ পর্যায়ের বাস্তবতা আলাদা। অনেক উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এখনো পর্যাপ্ত পিইপি ভ্যাকসিন থাকে না। প্রাণিসম্পদ বিভাগের সাথে স্বাস্থ্য বিভাগের সমন্বয় দুর্বল। গ্রামে গ্রামে কুকুর ভ্যাকসিনেশনের জন্য প্রশিক্ষিত জনবল ও অর্থায়নের ঘাটতি আছে। দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দুটি দেশের উদাহরণ বাংলাদেশের জন্য অনুপ্রেরণা হতে পারে।

শ্রীলঙ্কা ২০২০ সালে ডব্লিউএইচও-র স্বীকৃতিতে র‍্যাবিস-মুক্ত দেশের তালিকায় উঠেছে — দক্ষিণ এশিয়ায় প্রথম। এর পেছনে ছিল ৩০ বছরের ধারাবাহিক কুকুর টিকাদান কর্মসূচি, কঠোর ব্যবস্থাপনা এবং পিইপি-এর সর্বজনীন প্রাপ্যতা। থাইল্যান্ড ২০২০ সালে র‍্যাবিসে মৃত্যু শূন্যে নামিয়ে আনে। তারা সফল হয়েছে “ওয়ান হেলথ” পদ্ধতির কঠোর বাস্তবায়নের মাধ্যমে। এই দেশগুলোর সাফল্যের মূল রহস্য একটাই: সরকারের দীর্ঘমেয়াদি রাজনৈতিক অঙ্গীকার এবং কমিউনিটি পর্যায়ে কাজের ধারাবাহিকতা। দেশের সাড়ে চার হাজারের বেশি ইউনিয়নে পিইপি পৌঁছে দেওয়া এবং ভ্যাকসিনের কোল্ড চেইন বজায় রাখা প্রায় অসম্ভব চ্যালেঞ্জ। অনেক প্রত্যন্ত উপজেলায় বিদ্যুৎ সরবরাহ অনিয়মিত। তাছাড়া, কুকুরের কামড়কে গুরুতর মনে না করা এবং ঝাড়ফুঁকে বিশ্বাস এখনো বড় বাধা।

রাফির মতো শিশুদের মৃত্যু অনিবার্য নয়। যথাসময়ে টিকাদান, সময়মতো হাসপাতালে যাওয়ায়, সাবান-পানি দিয়ে ক্ষত স্থান ধুয়ে নেওয়ায় মতো কাজগুলোই জীবন বাঁচাতে অগ্রণী ভূমিকা রাখতে পারে। আর এজন্য জনসচেতনতা তৈরি করতে হবে আমাদেরকেই। প্রতিটি উপজেলায় পিইপি নিশ্চিত করতে হবে, কুকুর টিকাদান কর্মসূচিতে গতি আনতে হবে এবং কমিউনিটি পর্যায়ে সচেতনতা তৈরিতে বিনিয়োগ করতে হবে। পরিবার ও সমাজকে শিখতে হবে – কুকুরের কামড় মানে ওঝার কাছে যাওয়া নয় বরং হাসপাতালের দিকে ছোটা। অন্যথায় যে কামড় আজ ছোট মনে হচ্ছে সেটাই কাল প্রাণ নিতে পারে।

#

লেখক: সহকারী তথ্য অফিসার, তথ্য অধিদফতর

পিআইডি ফিচার